International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-I, July 2016, Page No. 01-10
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর ‘নারীশক্তি’ বা ‘অশ্রুমালিনী’: একটি পুনঃপাঠের প্রস্তাবনা

ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, আসাম, ভারত

Abstract

Surendra Kumar Chakraborty’s novel ‘Narishakti Ba Aushrumalini’ is regarded as the first successful social novel in Barak Valley. Here an attempt has been made to study the place of this novel in the light of development of the tradition of the novels written in Barak Valley given special emphasis on the social, cultural aspects of the Valley.

সূচনাবিন্দু: দক্ষিণ আসামের একটি প্রান্তিক জনপদের নাম বরাক উপত্যকা। প্রাচীন বরবক্র নদী উপত্যকার বর্তমান নাম বরাক উপত্যকা। কাছাড়,করিমগঞ্জ ও হাইলকান্দি এই তিনটি জেলা নিয়েই বরাক উপত্যকা।এই তিন জেলার প্রায় নব্বই শংতাশ মানুষই বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি। অসমীয়া প্রধান রাজ্যে বাংলা ভাষী মানুষেরা মাতৃভাষা বাংলা রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করে আসছে। এই উপত্যকায়ই স্বাধীন ভারতবর্ষে মাতৃভাষা রক্ষার জন্য ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে মে শিলচরে ১১ জন বাঙালি আত্ম বলিদান দিয়েছিল, এবং পরবর্তীকালে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে করিমগঞ্জ শহরে আরও দুজন শহিদ হয়েছিল। শহিদের রক্তস্নাত বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষা চর্চার ইতিহাস কয়েকশ বছরের পুরনো। ড. সুকুমার সেনের মতে-

> “কাজকর্মে বাংলা গদ্যের প্রথম এবং ব্যাপক ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দী হইতে ত্রিপুরা-কাছাড়-কামতা অঞ্চলেই পাইতেছি”। (‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’ পৃঃ, ২০৭)

উপরোক্ত ‘কাছাড়’ অঞ্চল বর্তমান বরাক উপত্যকার তিনটি জেলার মধ্যে একটি, আগে বরাক উপত্যকা বলতে সমগ্র কাছাড়কেই বুঝাত। কেননা বরাক উপত্যকার তিনটি জেলা নিয়ে একসঙ্গে অবিভক্ত কাছাড় জেলা ছিল। বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষা চর্চার ইতিহাস মূলত বৃহত্তর বাংলা ভাষাচর্চার ঐতিহ্যানুসারী।

আধুনিক বরাক উপত্যকার সাহিত্যচর্চা মূলত কবিতা কেন্দ্রিক। বহু শতাব্দী থেকে কবিতার চর্চা হয়ে আসছে বরাক উপত্যকায়। এজন্য মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ হয়তো কতকাংশে দায়ী। বরাক উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র শিলচর শহরকে বলা হয় ‘কবির শহর’ বরাকের আকাশে বাতাসে কবিতার মর্মরধ্বনি ধ্বনিত হয়। বরাকের মাটি-হাওয়া-জল জন্ম দিয়েছে কবি অশোকবিজয় রাহা, মৃণালকান্তি দাশ, রসময় দাস, দেবেন্দ্রকুমার পালচৌধুরী, সুধীর সেন, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, রুচিরা শ্যাম, অনুরূপা বিশ্বাস, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, রণজিৎ দাস প্রমুখ কবিদের।

বরাক উপত্যকায় কবিতা রচনার ইতিহাস বহুদিনের। বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর সবক’টি কবিতা আন্দোলনের ধারা বরাক উপত্যকায় প্রবাহমান। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকেই কবিতা ছুঁয়ে যায়। কবিতা বরাক উপত্যকার মানুষের প্রাণ স্পন্দন। যদিও সুযোগ সুবিধার অভাবে বহু কবির কবিতা কাব্যাকারে প্রকাশের সুযোগ পায়নি, কিন্তু যা প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকাও দীর্ঘ।

কবিতা পাগল বরাক উপত্যকায় সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর 'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' উপন্যাস ব্যতিক্রম ধর্মীতার পরিচায়ক বটে। 'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' বরাক উপত্যকার প্রথম সামাজিক উপন্যাস। বরাক উপত্যকার উপন্যাস শিল্পে সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর এই উপন্যাস একটা মাইলষ্টোন।

'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' উপন্যাসের একটি বিজ্ঞাপন প্রাসঙ্গিক বোধে এখানে তুলে ধরা হল-

> " 'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' উপন্যাসের বিজ্ঞাপন-
> উপন্যাস জগতে যুগান্তর।
> ভাব মন্দাকিনীর নূতন ধারা-কাব্য-কাননে নব বসন্ত জাগরণ"।
> চিত্তবৃত্তি বিশ্লেষণে ও চরিত্র চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত চিন্তাশীল লেখক- শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
> বিএ প্রণীত
> "নারীশক্তি" বা "অশ্রুমালিনী"
> শুধু কবির কল্পনা নয়, ভাবের উন্মাদনা নয়;
> ভাব কল্পনার মধ্যে দিয়ে সত্যের প্রেরণা !!
> পাঠ করুণ-বুঝিবেন-
> অন্তঃপুরই সমাজ শক্তির কেন্দ্রস্থল;
> অন্তঃপুরের অধিষ্ঠাত্রী নারীই এই গুপ্ত শক্তির লীলাময়ী নির্ঝরিণী"।
> ('নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' সম্পাঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য পৃঃ১৭৫)

বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত "ভাব-মন্দাকিনীর নূতন ধারা, কাব্য কাননে নব বসন্ত জাগরণ" সত্যিকার অর্থে বরাক উপত্যকার কাব্য কাননে উপন্যাস রূপী 'নববসন্তের' জাগরণ ঘটল 'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী'-র হাত ধরে।

বরাক উপত্যকার সামাজিক উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্হিবঙ্গের এক প্রান্তিক অঞ্চলে বসে যে সময়ে এই উপন্যাস রচিত হয়েছে, সে সময়ের প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাসের গুরুত্ব অনেক। 'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে বরাক উপত্যকার সামাজিক উপন্যাসের নান্দীপাঠ শুরু হয়। উপন্যাস শিল্প হিসাবে 'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' কতটা সার্থক সে বিতর্ক পরে, কিন্তু যে সময় ও পরিসরের এই উপন্যাস রচিত হয়েছে তা একথায় দুঃসাহসিক অভিযান। অভিযাত্রী গবেষক হিসেবে আজকের অর্ন্তজাল যুক্ত সময়ে বসে আমরা শিল্পের সার্থকতা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সময়ে একটি প্রান্তিক অঞ্চলে বসে সামাজিক উপন্যাস রচনা করার মতো দুঃসাহসিক কাজ তো অভিযানেরই নামান্তর।

বরাক উপত্যকার উপন্যাসঃ শুরু থেকে সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী: বরাক উপত্যকায় উপন্যাস শিল্পের নান্দীপাঠ হয় ১২৮৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হারাণচন্দ্র রাহার 'রণচণ্ডী' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। কাছাড়ের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল। কিন্তু উপন্যাসটি যথার্থ অর্থে উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া হারাণচন্দ্র রাহা আদৌ বরাক উপত্যকার বাসিন্দা কিনা সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। হারাণচন্দ্র রাহাকে নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থে ড. বিজিত কুমার দত্ত 'হারাণচন্দ্রকে কাছাড়ের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন' ('বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস' কলিকাতা, চতুর্থ সংস্কারণ ১৪০২, পৃঃ ২০৯)। কিন্তু ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্য সে ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি মনে করেন "আনুসাঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে মনে হয় হারাণচন্দ্র রাহা কাছাড়ের অধিবাসী নন, তবে কিছুদিন তিনি কাছাড়ে বসবাস করেছিলেন"। ('নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' সম্পাদক অমলেন্দু ভট্টাচার্য, মহাজাতি প্রকাশন কলকাতা-৭০০৭৩ পৃঃ, ৮)। তাছাড়া তাঁর নামে আরও কয়েকটি উপন্যাস পাওয়া গেছে। সেগুলো হল 'বাল্যসখী' কলিকাতা ২৩, অক্টোবর, ১৮৮৩) 'নাড়ু গোপাল' (কলিকাতা ২৪ আগষ্ট ১৮৮৫), 'পদ্মমাসি' (কলিকাতা ৭ মার্চ, ১৮৮৫)। সব ক'টি উপন্যাসই

কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে আমাদের অনুমান তিনি পশ্চিমবঙ্গেরই লোক, কর্মসূত্রে কিছুদিন হয়তো কাছাড়ে ছিলেন। তাছাড়া ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য মনে করেন “হারাণচন্দ্র যদি কাছাড়ের অধিবাসী হতেন তা হলে স্থানীয় স্তরে সাহিত্য এবং ইতিহাস চর্চার যে সব ইতিবৃত্ত মূলক আলোচনা বা কোষ গ্রন্থ জাতীয় সংকলন প্রকাশিত হয়েছে সে সব রচনায় কোন না কোন সময় তাঁর নাম উল্লেখিত হত। অথচ তা হয়নি। (তদেব পৃঃ ৯)। আমরাও তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করছি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে রামকুমার নন্দী মজুমদারের লেখা ‘মালিনীর উপ্যাখান’ (১৮৯২) উপন্যাস ধর্মী আখ্যান প্রকাশিত হয়। লেখক রামকুমার নন্দী মজুমদার বরাক উপত্যকার বাসিন্দা। বরাক উপত্যকার মাটি-হাওয়া-রোদ্রে তার বেড়ে ওঠা। ‘মালিনীর উপ্যাখান’ যথার্থ উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত রচনা বলা যেতে পারে। কোন বির্তকে না গিয়েও বলা যেতে পারে প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কাজটা রামকুমার নন্দী মজুমদার করলেন তাঁর ‘মালিনীর উপ্যাখান’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। রামকুমার নন্দী মজুমদারের পথ অনুসরণ করে লাব্যণকুমার চক্রবর্তী রচনা করেন ‘মহারানী ইন্দুপ্রভা’ উপন্যাস। ‘শ্রীভূমি’ (১৯১৫) পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে, বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দ থেকে প্রকাশিত হয় ‘মহারানী ইন্দুপ্রভা’ উপন্যাস। পুরো উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি, কেননা একবছর পর ‘শ্রীভূমি’ পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে উপন্যাসটির প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়। বরাক উপত্যকার পার্শ্ববর্তী রাজ্য মণিপুরের রাজপরিবারের কাহিনি নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়।

বরাক উপত্যকার মাটি, মানুষ ও সমাজ জীবন নিয়ে প্রথম উপন্যাস রচিত হয় সরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর হাতে- ‘নারীশক্তি’ বা ‘অশ্রুমালিনী’ (১৯২৫)। এই উপন্যাস বরাক উপত্যকার প্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাস। পেশায় শিক্ষক (নরসিংহ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক) সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর (জন্ম ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা এপ্রিল, মৃত্যু ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে এপ্রিল) প্রথম উপন্যাস ‘স্নেহের বাঁধন’ (১৯২৪)। ‘স্নেহের বাঁধন’ উপন্যাস জর্জ ইলিয়টের ‘সাইলাস মার্নারের’ অনুকরণে লেখা। ‘সাইলাস মার্নারের’ অনুকরণের লেখা হলেও অনেকটাই মৌলিক উপন্যাসের পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছে ‘স্নেহের বাঁধন’। ‘সাইলাস মার্ণারের’ কাহিনির রূপান্তর ঘটিয়েছেন এই উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্যের অভিমত প্রণিধানযোগ্য-

“বিদেশী উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে লিখিত হলেও ‘স্নেহের বাঁধন’-এ পাশ্চাত্য প্রভাবের কোন চিহ্ন নেই। ঔপন্যাসিক আশ্চর্য দক্ষতায় বিদেশি চরিত্র গুলির বঙ্গীকরণ করেছেন”। (‘নারীশক্তি’ বা ‘অশ্রুমালিনী’ পৃঃ ১৭) সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মূলত কবি ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চার হাতে খড়ি। তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বেশির ভাগ রচনাই কবিতা। এক নজরে সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর রচনাবিশ্ব-

কবিতা :

পল্লীবাংলার পতি পূজা	অপ্রকাশিত
প্রবাসীর পত্র	”
পুরুষ জীবনে রমণী	”
স্বভাব প্রেম (সত্য ঘটনা মূলক)	”
মানব লীলা	”
সোনার বাংলাদেশ	‘প্রভাত’ ফাল্গুন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ
চিনলে নাকি তারে	‘প্রভাত’ চৈত্র, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ
জীবন প্রহেলিকা	‘কুসুম’ পত্রিকায় প্রকাশিত
বিফল প্রয়াস	”
বাল্য স্মৃতি	”

প্রবন্ধ:

দুটি প্রেমধারা (হেমলতা ও শৈবলিনী) 'শ্রীভূমি' প্রথম বর্ষ ১২ শ সংখ্যা চৈত্র, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।
সমাজে নারীর স্থান অপ্রকাশিত
কবি ও কাব্য অপ্রকাশিত

গীতি সঙ্কলনঃ

কলঙ্ক ভঞ্জন : স্মরণিকা,কাছাড় বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, ষষ্ট অধিবেশন,শিলচর ১৩৯০-৯১ বঙ্গাব্দ

উপন্যাসঃ

স্নেহের বাঁধন (২য় সংস্করণ) : প্রকাশক শ্রী বৈদ্যনাথ দে, সরস্বতী লাইব্রেরী শিলচর, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ

'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী': প্রকাশকঃ শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র চক্রবর্তী পাটুয়াটুলি, ঢাকা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ

কবি সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর উপন্যাস রচনার মূলে রয়েছে গভীর দাম্পত্য প্রেম। তাঁর উপন্যাসেও এই দাম্পত্য প্রেমের ছায়া পড়েছে। স্ত্রী সরোজিনী দেবীকে তিনি প্রচুর ভালবাসতেন। তিনি চেয়েছিলেন স্ত্রীরা শিক্ষাদীক্ষায় পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠুক, তাই তো নিজের স্ত্রীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য তখনকার সময়ে গৃহ শিক্ষিকা নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর গৃহ শিক্ষিকা ছিলেন কাছাড়ের তারাপুর অঞ্চলের বিশিষ্ট চিকিৎসক ড. অপূর্ব কুমার দত্তের ভাগিনেয়ী সৌদামিনী দত্ত। সুরেন্দ্রকুমারের স্ত্রী সরোজিনী দেবী অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাস পড়ে স্বামীকে অনুরোধ করলেন একটা উপন্যাস রচনা করার জন্য। স্ত্রীর অনুরোধে তিনি উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন এবং রচনা করলেন 'স্নেহের বাঁধন'। এ প্রসঙ্গে ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্যের ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য-

> "অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাস পড়ে সরোজিনী দেবী অনুপ্রাণীত হয়ে স্বামীকে বললেন- "আপনি এত জ্ঞানী মানুষ! এরকম বই কি আপনি লিখতে পারেন না?" সুরেন্দ্রকুমার মৃদু হেসে বলেছিলেন- 'তুমি বললে লিখতে পারি!' সেই শুরু। কবি প্রাবন্ধিক সুরেন্দ্র কুমার হলেন ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রকুমার"। ('নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' পৃঃ, ১৯৮)

'স্নেহের বাঁধন' মূলত বিয়োগান্তক উপন্যাস। নায়িকা মৃণালিনীর বিরহের মধ্য দিয়ে উপন্যাস সমাপ্তি বিন্দুতে পৌঁছায়। মৃণালিনীর এই বিরহ উপন্যাসিক সুরেন্দ্রকুমারের স্ত্রী সরোজিনী দেবী মেনে নিতে পারেন নি। তাই স্বামীকে অনুযোগ করলেন, মৃণালিনীর বিরহ যেন তারই বিরহ হয়ে গেছে। তিনি বিরহের কথা শুনতে চান না ' আমি বিরহের কথা শুনতে চাই নি, মিলনের কথা শুনতে চাই।' সুরেন্দ্রকুমার কথা দিলেন এবার মিলনান্তক উপন্যাস লিখবেন। লেখা হল 'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' (তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১৯৮)।

সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী সরোজিনী দেবীর জন্যই হয়তো বরাক উপত্যকার প্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাস 'অশ্রুমালিনী' বা 'নারীশক্তি' ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া গেল, না হলে হয়তো আরো দেরী হতো বরাক উপত্যকার প্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে। আমাদের অপেক্ষা করতে হত ষাটের দশক পর্যন্ত। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে 'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' রচনার আরো ৩৩ বছর পর ১৯৫৮ সালে রামেন্দ্র দেশমুখ্যর 'ইভাক্যুয়ি' ও 'মরসুমী ফুল' নামে দুটি উপন্যাস বের হয়।

'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী'র উপন্যাসের কাহিনি: 'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' উপন্যাসের নায়িকা যোগরাণী। তাকে কেন্দ্র করেই গোটা উপন্যাস। তার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাতই উপন্যাসের উপজীব্য। যোগরাণী শ্যামগ্রামের জমিদার কালীচরণ রায় এর একমাত্র কন্যা। তার বিয়ে হয়েছিল রাধানগর এর ক্ষয়িষ্ণু জমিদার প্রাণধন গুপ্ত ও ভুবনেশ্বরীর একমাত্র ছেলে পরেশের সঙ্গে। প্রাণধন গুপ্ত তার ছেলেবেলার বন্ধু কালীচরণ বাবুর মেয়ে যোগরাণীকে

বিনা পণে তার পুত্রবধূ করে এনেছিলেন। কেননা তিনি যোগরাণীর গুণে মুগ্ধ হয়ে ছিলেন। তাই লক্ষ্মীযুক্ত মেয়ের সঙ্গে ছেলে পরেশের বিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা ভুবনেশ্বরী ও তার দাম্পত্য জীবন বিষময় হয়ে উঠেছিল ভুবনেশ্বরীর জন্য। দাম্পত্য জীবনের বিষফল যাতে তার ছেলে পরেশের জীবনকে বিষময় করে তুলতে না পারে সে দিকেই ধ্যান দিয়েছিলেন প্রাণধন গুপ্ত। কিন্তু ভুবনেশ্বরী যৌতুক বা পণ ছাড়া কিছুতেই ছেলের বিয়ে দেবেন না। নাছোড়বান্দা স্বামীর একগুয়েমিতেই যোগরাণী ও পরেশের বিয়ে হলেও দাম্পত্য জীবন সুখের হল না। শাশুড়ী ভুবনেশ্বরীর নির্যাতন এবং স্বামী পরেশের অন্ধ মাতৃভক্তি যোগরাণীর জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলে, অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে অভিমানে যোগরাণী স্বামীর ঘর ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে যায়। তাতে শাশুড়ি ভুবনেশ্বরী প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ছেলে পরেশকে দ্বিতীয়বার বিয়ের পীড়িতে বসায়। কিছুদিনের মধ্যে পরেশ ও ভুবনেশ্বরীর জীবন নতুন বৌয়ের দ্বারা দুর্বিষহ হয়ে উঠে। ভুবনেশ্বরীর সাধের ঘর ভেঙে যায়। কারণ পরেশের নতুন বৌ পরেশকে প্রত্যাখান করে। পরেশ প্রথম স্ত্রী যোগরাণীর মর্ম বুঝতে পারে। অনুতপ্ত পরেশ কিছুদিনের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কোম্পানীর তহবিল তছরূপের দায়ে সে জেলে যায়। তার জেল যাওয়ার খবর পেয়ে যোগরাণী অস্থির হয়ে উঠে এবং স্বামীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য সে বদরপুর আসে এবং নীরদের সহায়তায় সে স্বামীকে জেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। উপন্যাস শেষে বদরপুর সিদ্ধেশ্বর ধামে গুপ্ত পরিবারের পুর্নমিলন হয়। আপাত সরল কাহিনির শেষে নারী শক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে।

'নারীশক্তি' বা 'অশ্রুমালিনী' উপন্যাসের ব্যবচ্ছেদ: ২৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসে চরিত্র সংখ্যা সর্বমোট ২০টি। তার মধ্যে মুখ্যচরিত্র ৭টি। গৌণ চরিত্র ১৩টি। সাতটি মুখ্য চরিত্রের মধ্যে যারা রয়েছে তারা হল- প্রাণধন গুপ্ত, ভুবনেশ্বরী দেবী, কালীচরণ রায়, মন্দাকিনী, যোগরাণী, নীরদ ও পরেশ। গৌণ চরিত্রের মধ্যে রয়েছে প্রাণধন গুপ্তের ঝি (ধাইমা), মথুরানাথ, মোক্ষদা, রাধারাণী, নন্দলাল, নীরদের মা, নিরুপমা, নির্মল, ক্ষীরোদ, রেল ইন্সপেক্টর, কিরণ, বউদিদি (কিরণের স্ত্রী) ও সুরজা।

'অশ্রুমালিনী' বা 'নারীশক্তি' উপন্যাস যোগরাণীর কাহিনি। নায়িকা যোগরাণীকে কেন্দ্র করে গোটা উপন্যাসের বাকি চরিত্রগুলো আবর্তিত হয়েছে । একটি চিত্রের মাধ্যমে ব্যাপারটা দেখানো হলো—

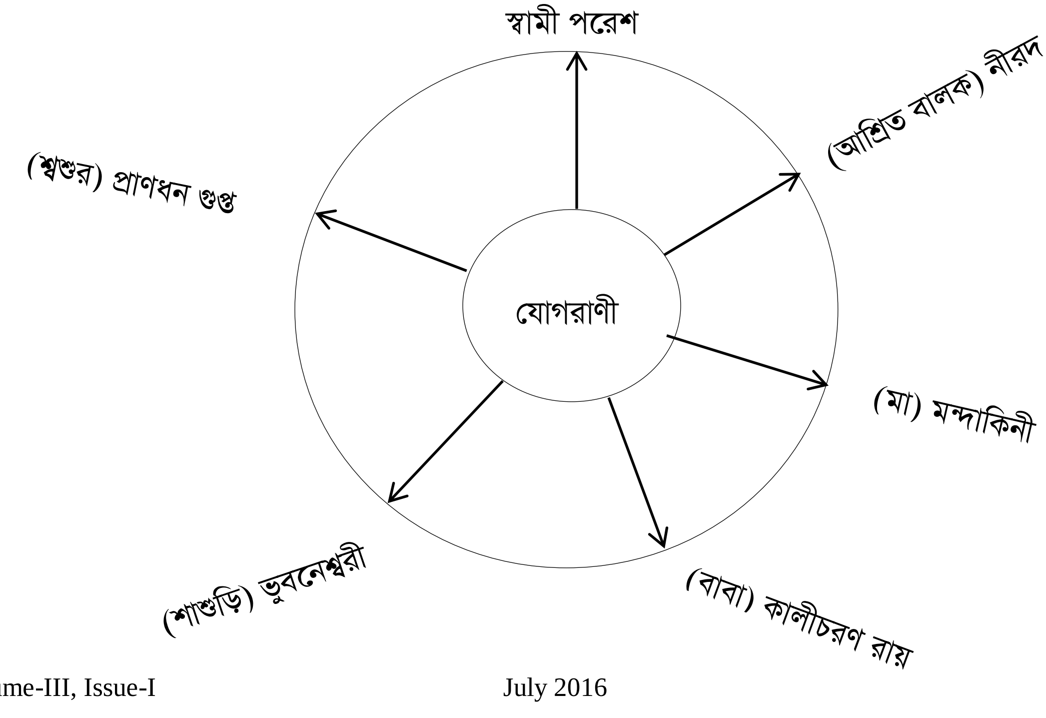

‘নারীশক্তি’ বা ‘অশ্রুমালিনী’ নায়িকা প্রধান উপন্যাস। যোগরাণীর বিপ্রতীপে দুটো পুরুষ চরিত্র আছে, তাদের একজন হল যোগরাণীর স্বামী পরেশ এবং দ্বিতীয়জন হল নীরদ, সে যোগরাণীর পিতার আশ্রিত। যোগরাণীর মা মন্দাকিনী দেবী নীরদের গুণে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে তার সঙ্গেই মেয়ে যোগরাণীকে বিয়ে দিবেন বলে স্থির করে নেন। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে সেটা সম্ভব হয়ে উঠেনি। অথবা বলা ভাল নীরদের হীনমন্যতায় তার সে সাধ পূর্ণ হয়নি। নীরদও যোগরাণীর গুণে মুগ্ধ। কিন্তু অন্তরের হীনমন্যতাবোধে তার দুর্বলতা সে তার মনের মধ্যে চেপে রাখে তাতে বিপরীত ফল হল। যোগরাণীর জীবনে বিপর্যয়ের জন্য কতকটা হলেও সে দায়ী। যোগরাণীর জীবনে করুণ বিপর্যয় নেমে আসত না, যদি নীরদ যোগরাণীর মা মন্দাকিনী দেবীর প্রশ্নের উত্তর দার্শনিক ভাবে না দিয়ে সহজভাবে দিত। বাগানে ফুল পাড়তে পাড়তে ‘ছোট মা’ অর্থাৎ যোগরাণীর মা মন্দাকিনী দেবী তাকে প্রশ্ন করলেন—

> “... সহসা মন্দাকিনী বলিয়া উঠিলেন
> আমার একটা কথা শুনবে নীরদ?”

নীরদ তাহার ছোট মার কণ্ঠস্বরে আকস্মিক কঠোরতায় চমকিয়া উঠিল। আবার মন্দাকিনী বলিলেন— “ঠিক উত্তর দিতে হবে”। নীরদ কম্পিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল— “কি কথা মা?” “আচ্ছা, ঐ যে দেখছ দুইটি লতা জন্মাবধি একটি আরটিকে জড়াইয়া ধরিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে”- তুমি কি জোর করিয়া এই দুটি লতাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে?”

কোন কিছু না ভাবিয়া নীরদ বলিয়া উঠিল

> --“কেন পারব না মা?”
> “দেখ নীরদ বিচ্ছিন্ন হইলে দুইটি লতাই শীর্ণ মলিন হইয়া পড়িবে, হয়তো না বাঁচিতে পারে—তুমি কি অতুটুকু নিষ্ঠুর হইতে পারিবে?”
> “প্রয়োজন হইলে কেন পারব না মা”
> (‘নারীশক্তি’ বা ‘অশ্রুমালিনী’ পৃঃ ৩৯)

যোগরাণীর বিয়ের ঠিক আগে যোগরাণীর মা মন্দাকিনী তাকে কিন্তু স্পষ্ট বুঝানোর চেষ্টা করেছেন- “বিচ্ছিন্ন হলে দুইটি লতাই শীর্ণ মলিন হইয়া পড়িবে; হয়তো না বাঁচিতে পারে”। -এ কিসের ইশারা? এ ইশারা তো যোগরাণী ও নীরদের ভাবী জীবনের ইশারা। নীরদের মতো সব বিষয়ে পরিপক্ক একটি ছেলের এ ইশারা না বুঝার কথাও নয়। কিন্তু পরান্নে প্রতিপালিত হীনমন্যতাবোধে নীরদ নীতির ধ্বজা তলে সমাধিস্থ হলো।

বঙ্কিমী আদর্শে অনুপ্রাণিত ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী নীতিবোধের কাছে পার্থিব জীবনবোধকে অঞ্জলি দিলেন। যে কারণে নীরদকে আমরা নায়কের মর্যাদা দিতে পারলাম না। যদিও সমস্ত উপন্যাস জুড়ে নীরদকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। যোগরাণী ও পরেশের দাম্পত্য জীবন পুনরায় জোড়া লাগাতেও সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবুও সে নায়ক নয়। নায়িকা যোগরাণীকে আদর্শ নারী করে তুলতে সে কেবল এক সহযোগী অনুঘটকের কাজ করেছে।

‘নারীশক্তি’ বা ‘অশ্রুমালিনী’ উপন্যাসের আরো একটি পুরুষ চরিত্র হল পরেশ। সে যোগরাণীর স্বামী। প্রবল ব্যক্তিত্ব গুণ সম্পন্না যোগরাণীর তুলনায় সে নিস্প্রভ। অতি মাতৃভক্তি ও ভয় তাকে আরো নিস্প্রভ করে দিয়েছে। সে যেন মেরুদণ্ডহীন এক পুরুষ চরিত্র। নিজের মায়ের কাছে তারই বিবাহিতা স্ত্রীকে লাঞ্চিত হতে দেখেছে, দেখেও সে নীরব, তার একটাই কথা “অত দায় টায় বুঝিনা। আমি কিছুতেই মাতা-পিতার অবাধ্য অসংযত পুত্র বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব না”। (‘নারীশক্তি’ বা ‘অশ্রুমালিনী’ পৃঃ ৮১)

‘মাতা-পিতা’ না বলে শুধু ‘মাতা’ বললে ভাল ছিল কারণ তার পিতা প্রাণধন গুপ্ত অকৃত্রিম ভাবে চেয়েছিলেন যোগরাণীর সঙ্গে পরেশের সুখী-সুন্দর দাম্পত্য জীবন। যা তার মা ভুবনেশ্বরী দেবী চাননি। যোগরাণী যখন তাকে প্রশ্ন করল— “কিন্তু স্ত্রীর কাছে হৃদয়হীন অপ্রেমিক স্বামী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে”।

উত্তেজিত কণ্ঠের এই খোঁচা কথায় মরমে আঘাত পাইয়াই যেন ব্যাথাতুর ক্ষুব্ধ দৃষ্টি যোগরাণীর দিকে তুলিয়া তেমনিই উত্তেজনা ভরে পরেশ যা বলিয়া বসিল- “আগেইতো জানি আমায় নিয়ে তুমি সুখী হবে না; নীরদই তোমার উপযুক্ত স্বামী হইত,- তাকে পেলেই তুমি সুখী হতে” -অথচ আমরা দেখলাম এরকম কোন প্রেক্ষাপট কখনই তৈরী হয়নি উপন্যাসে। পরেশের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, কেননা সে তো তার মায়ের চোখেই যোগরাণীকে দেখতো, স্বামীর চোখ দিয়ে স্ত্রী কে যে দেখা, এ দেখা তো সে কখনই দেখেনি। মাতৃপ্রেমে অন্ধ পরেশ স্ত্রীকে গুরুত্বই দিলনা। কিন্তু যোগরাণী তো সবটুকু চায়নি, সে চেয়েছিল পরেশ তার বাবা মায়ের সঙ্গে তাকেও যেন একটু স্বামীর প্রেমের ভাগী করে। এ চাওয়া তো সংসারের চিরকালীন চাওয়া। তাছাড়া যে নীরদকে নিয়ে পরেশ স্বামী হয়ে যোগরাণীকে এতবড় অপবাদ দিলো, আমরা পাঠক হিসাবে দেখলাম পরেশের সঙ্গে যোগরাণীর বিয়ের পর কোন দিনও যোগরাণী নীরদের কথা ভাবেনি। এমনকি বিয়ের পর মোক্ষদার হাতে নীরদ যে চিঠি পাঠিয়েছিল সে চিঠির জবাব পর্যন্তও দেয়নি। যোগরাণীর কাছে সুযোগ ছিল স্বেচ্ছাচারী হওয়ার। কিন্তু সে হয়নি। পরেশের বিশ্রি ইঙ্গিত (নীরদকে জড়িয়ে) কিংবা বলা ভাল চরমাঘাতের পর তার অবস্থা ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী এভাবে দিয়েছেন—

> “তৎমুহূর্তে দুই হস্তে কর্ণ চাপিয়া ধরিয়া যোগরাণী কম্পিত দেহে গৃহতলে পড়িয়া যাইতে গিয়া টেবিলের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। স্ত্রী চরিত্রে অনভিজ্ঞ স্বামীর এই অসতর্ক নিদারুণ আঘাতে স্ত্রীর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল— অস্তিপঞ্জর খসিয়া যাইতে লাগিল! আহতা বালিকা বুঝিল তাহার হৃৎপিণ্ড কেন্দ্রচ্যুত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া খসিয়া পড়িতেছে;- এতদিন তাহার যে মেরুদণ্ড চিন্তাজীর্ণ কঙ্কালসার দেহভারকে বহিয়া লইয়া চলিতেছিল, আজ যেন সে মেরুদণ্ড অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। উঃ! কি নিদারুণ বজ্রাঘাত! সে কি শুনিতে আসিয়া কি শুনিল! একি পরেশচন্দ্র? তুমিই না তাহার স্বামী? তুমি স্বামী হইয়াও বুঝিলে না যে নারী সংসারে আর সমস্ত নিষ্ঠুর অস্ত্রাঘাতই সহ্য করিতে পারে—কেবল এই মর্মভেদী শেলাঘাতটিই সহ্য করিতে পারে না—এইটিই - এই অবিশ্বাস বাণীই নারীর মরণাস্ত্র”। (তদেব পৃঃ ৮১)

যে বিশ্বাস নিয়ে সে স্বামীর ঘরে এসেছিল। যে শক্তিতে এতদিন ধরে যোগরাণী শাশুড়ির সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে আসছিল আজ পরেশের এই আঘাতে যোগরাণীর বিশ্বাসের ভিত পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তারপরও হিন্দু নারীর সংস্কার নিয়ে সে পরেশের অমঙ্গল কামনা করেনি।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখলাম পরেশ তেল কোম্পানীর তহবিল তছরূপের দায়ে জেলে গেছে। অথচ তা হওয়ার কথা ছিলনা। পরেশের হয়তো নিজের উপর ঘৃণা ধরে গিয়েছিল। সে চাইছিল চিত্তশুদ্ধি। নিজেকে নিজে শাস্তি দিতে চাইছিল সে। নীরদ ও সুরজার সুখী দাম্পত্য জীবন এবং তার দ্বিতীয় বারের বিবাহিত বধূর অস্বাভাবিক আচার আচরণ তার চোখ খুলে দিয়েছে। তার দ্বিতীয় পত্নী তাকে সন্দেহ করে যখন প্রত্যাখ্যান করল-

> “তর্জনী সঞ্চালনে বলল- “ছেড়ে দাও বলছি; অসচ্চরিত্র স্বামীর মুখ দেখাও পাপ;- এতদিনে বুঝেছি দিদির কেন এ গৃহে বাস হয় নাই;- আমারও সে পথে যেতে হবে”...
>
> -“এই বলিয়া সে সজোরে অঞ্চল ধরিয়া লইয়া দর্পভরে বাহিরে চলিয়া গেল; সেই টানের চোটে পরেশ সম্মুখস্থ টেবিলের উপর নুইয়া পড়িল।- মাথা তুলিতে পারিল না -সেই তর্জনী সঞ্চালন বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় তাহার কর্ণ বধির করিয়া চলিয়া গিয়াছে”।...

সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিয়া অমানিশার ঘোর ঘনান্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল!” (তদেব, পৃঃ ১৪৩)

আমরা বলতে পারি আত্মশুদ্ধির পথ সে ধরল। আত্ম অনুশোচনা থেকে পরেশ জেলে গেছে। সেখান থেকে যোগরাণী তাকে মুক্ত করলে যোগরাণীর কাছে সে তার ভুল স্বীকার করেছে—“জীবনে ভুল বুঝে তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি রাণী”। (তদেব, পৃঃ ১৬৫)

যোগরাণীর তুলনায় সে এক নিষ্প্রভ চরিত্র। নায়ক হবার মর্যাদা সে দাবী করতে পারে না। নীরদ ও পরেশ কেউই নায়ক নয়। হয়তো ঔপন্যাসিকের তা উদ্দেশ্যও ছিলনা। উপন্যাসে নারীশক্তির জয় ঘোষণা করাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। ‘নারীশক্তি’ বা ‘অশ্রুমালিনী’ উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যোগরাণী সর্বব্যাপ্ত। উপন্যাসের শেষে উপন্যাসিক সুরেন্দ্রকুমার বঙ্কিমী স্টাইলে নীতির প্রচার করলেন—

> “সেই মণিমালিনী যোগরাণী আজ কত সুন্দর দেখাইতেছে। এই অশ্রুহার এই ভারতের প্রত্যেক নারীকণ্ঠে যেন। শোভা পায়— এই শান্তি জল এই অত্যাচার- কলুষিত বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়া যেন গৃহে গৃহে শান্তি আনয়ন করে”। (তদেব- পৃঃ ১৬৭)

‘নারীশক্তি’ বা অশ্রুমালিনী’উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা : যে কোন উপন্যাস আলোচনায় সে উপন্যাসের সমাজ নিয়ে আলোচনা খুবই জরুরী। “বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা” গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ রায় লেখেছেন—

> “উপন্যাসে পাই সমাজমধ্যগত মানুষের জীবন যাপনের একটা যথাসম্ভব বাস্তব চেহেরা। একলা মানুষ নয়। নিঃসঙ্গ মানুষ নয়, উপন্যাসে পাই ঘরোয়া মানুষকে, পারিবারিক মানুষকে, সামাজিক মানুষকে—নানা দিকের সম্পর্ক জালের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা জীবনের বহু বিচিত্র রূপের সমগ্রতাকে। মানুষ যখন একই সঙ্গে আত্মসচেতন এবং সমাজ সচেতন, নিজের ব্যক্তি সত্তা এবং নিজের বাস্তব পরিবেশ একই সঙ্গে যখন মানুষকে উত্তেজিত করে, তখনি আসে উপন্যাসের কাল”। (সত্যেন্দ্রনাথ রায়, “বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা”, পৃঃ ২৮)

বরাক উপত্যকার প্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাস ‘নারীশক্তি’ বা ‘অশ্রুমালিনী’ সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। ‘অশ্রুমালিনী’ উপন্যাসে বরাক উপত্যকার ‘ঘরোয়া মানুষ’, ‘পারিবারিক মানুষ’, ‘সামাজিক মানুষ’ এর কথা এক আশ্চর্য যাদুকাঠির স্পর্শে ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসে প্রতিফলিত সমাজ জীবন বরাক উপত্যকারই সমাজ জীবন। বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল দীপালোকে দাঁড়িয়ে ঔপন্যাসিক যে নারী শক্তির জয়গান গেয়েছেন, তা নবজীবন বোধেরই ছোঁয়া।

এমন এক সমাজ জীবনের ছবি চিত্রায়িত করেছেন ঔপন্যাসিক, যে সমাজ জীবন প্রাচীন জমিদার তন্ত্রের নাগপাশ থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে আসছে। উপন্যাসে বর্ণিত প্রথম প্রজন্মের কালীচরণ রায় জমিদার এবং শ্যামধন গুপ্ত ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান। ধীরে ধীরে আধুনিকতার সোনার যাদুকাঠির স্পর্শে নব জীবন বোধ সমাজ জীবনে আসতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের মাঝে শিক্ষার আলো পড়েছে, বরাক উপত্যকার সমাজ জীবন অশিক্ষার অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসছে। জমিদার কালীচরণ রায়ের ছেলে কিরণকুমার পড়াশুনা করে ডেপুটি হয়ে প্রথমে ডিব্রুগড় পরে গৌহাটি চলে গেছে। নীরদ শিক্ষিত এবং রেলের চাকুরী পেয়েছে। পরেশ ও এন্ট্রাস পাস করে ওয়েল কোম্পানিতে চাকুরী করছে। বরাক উপত্যকার নারী জীবনেও শিক্ষার ছোঁয়া লেগেছে। যোগরাণী শিক্ষিত, কতটুকু পড়েছে যদিও তা উপন্যাসে উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু নীরুদার কাছে অর্থাৎ নীরদের কাছে সে শিক্ষা নিয়েছে। সে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ পড়েছে –

> -“কৃষ্ণকান্তের উইল তাহার পড়া ছিল; তাই বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ শ্বশুড়ের এই ইঙ্গিত বাক্যে চিত্রিত ভাবী চিত্রের ভয়াবহ দৃশ্য তাহার মানস-নেত্রে উদিত হইবা মাত্র সে বালিকা ভীত হইয়া গেল”। (‘নারীশক্তি’ বা ‘অশ্রুমালিনী’ সম্পাদনা, অমলেন্দু ভট্টাচার্য- পৃঃ ৮৪)

সে চিঠি লিখতে পারে, শ্বশুরকে 'মহাভারত' পড়ে সে শুনিয়েছে। বরাক উপত্যকার সমাজ জীবনে বিংশ শতাব্দির প্রথম পাদে যথেষ্ট আলো দেখা গেছে। চা-বাগানের পত্তনের ফলে রেল লাইন ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢুকে গেছে এই উপত্যকায়। ফলে কৃষি নির্ভর সমাজ জীবন ধীরে ধীরে শিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছিল তারও ইঙ্গিত উপন্যাসে আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও নারী যথেষ্ট আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের একটি গৌণ চরিত্র নিরুপমার কৌতুকছলে একটি উক্তি এখানে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে নীরদের বোন নিরুপমার সঙ্গে যোগরাণীর কথা বার্তা হচ্ছিল, এই কথা বার্তার সময় নিরুপমা বলল—

> "এ যাত্রা মা যখন খুব আক্ষেপ করে চিঠি লেখলেন, তখন আমারও মনে একটু রাগ হলো। আমি উনির কাছে গিয়ে বললাম- 'আমার মা-বাপ কি আমায় তোমার কাছে বিক্রি করে ফেলেছেন যে, আমি তোমার কেনা দাসী হয়ে চিরদিন তোমার পায়ের কাছে পড়ে থাকব। একটা দিন ছুটে গিয়েও কি আমার মাকে দেখব না"। (তদেব পৃঃ ৭৩-৭৪)

সে সময়ের প্রেক্ষাপটে নিরুপমার এ উক্তি যথেষ্ট দুঃসাহসিক। এখানে নারীর আত্মসচেতনার কথাই ফুটে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে নারীর এই আত্মসচেতনা বোধ থেকে বরাক উপত্যকার সমাজ মানসের অগ্রগতির দিকটি দিবালোকের মত উদ্ভাসিত হয়েছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কিংবা সংবাদ মাধ্যমের অপ্রতুলতায় বাহিরের কোন খবরই যখন এখানে পৌঁছাত না, সে সময়ে নিরুপমার এরকম চিন্তা ভাবনা তাৎপর্যপূর্ণ। বলতে গেলে তখনকার বরাক উপত্যকায় নারীর অন্তর্জগত আপনা থেকে আপনি বিকশিত ছিল।

'পণ' বা 'যৌতুকের' মত জঘন্য প্রথা এখানে ছিল যদিও তা কিন্তু প্রথম প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।যা ধীরে ধীরে লুপ্ত হওয়ার পথে ছিল। যোগরাণীর জীবন যে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল তার পিছনেও কিন্তু পণ লোভী একজন নারীর হাত ছিল। পুরুষরা কিন্তু যৌতুকের বিরোধী ছিল, শ্যামধন গুপ্ত কিন্তু যৌতুক চাননি যোগরাণীকে পুত্রবধু করতে। যৌতুকের চেয়ে যোগরাণীর গুণই ছিল তার কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্য। 'পণ প্রথা' নিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে যথেষ্ট বিরুদ্ধ মনোভাব পোষিত হতে দেখি নীরদ এবং তার বন্ধুরা 'যৌতুক' কিংবা 'পণপ্রথা' নিয়ে তর্কবিতর্ক করেছে। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে এরকম এক ছবি আমরা দেখতে পাই-

> "নীরদ ও পরেশের সহপাঠী আরও কয়টি গ্রামের ছেলে আসিয়া সেই বৈঠকে যোগ দিত। সংবাদপত্র পাঠ ও তদন্তর্গত সঙ্গীন বিষয়গুলি নিয়া ইহাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলিত সংবাদপত্রের জোরে এক এক সময় এক একটি বিষয় নিয়া দেশে তুমুল আন্দোলন চলিত। তখনও পণপ্রথা লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছিল। একটি বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়ে পণ দানে অসমর্থ পিতার দুঃখে ব্যথিত হইয়া স্বীয় পরিধান বসন কেরোসিন সিক্ত করতঃ তাহাতে আগুন ধরাইয়া আত্মহত্যা করিয়া মুহূর্তকালের মধ্যেই সমস্ত দুঃখের অবসান করিল। ...
>
> ... আহো নারীর এই অভিমান, এই নীরব আত্মদান- এই অহিংস প্রতিশোধ- তুমি পুরুষের কত কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছ! সহস্র সহস্র রাজপুত রমণী এমনি অনলে আত্মহত্যা করিয়াছিল! কিন্তু সেই পরামুখাপেক্ষী অনন্যোপায় নারীদের আসন্ন সময়ে আত্মধর্ম রক্ষাকল্পে এই আত্মদান যেমন একদিকে তাহাদের যশ অর্জ্জন করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি তৎকালীন আত্মকলহে হীনবীর্য্য নারীরক্ষায় অসমর্থ রাজপুত বীরগণেরই কলঙ্ক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষরে অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে! আমরা কি আজ সেই কলঙ্কে কলঙ্কিত নই হে?" (তদেব, ১৩৩-১৩৪)

স্পষ্টতই আত্মবিশ্লেষণ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বরাক উপত্যকার মত প্রায়ন্ধকারময় এক জায়গায় বসে এরকম আত্মবিশ্লেষণ দেখে আমাদের মনে হয় সময়ের চেয়ে বহু এগিয়ে গেছে যুব প্রজন্মের চিন্তাধারা।

হিন্দুধর্মে বহু বিবাহের রেশ তখনও সমাজে ছিল। পরেশের দ্বিতীয় বিয়েতে তা স্পষ্ট। কিন্তু যুব প্রজন্ম তাতে সহমত পোষণ করেনি। পরেশকে নিয়ে ওরা হাসাহাসি করেছে। উপন্যাসের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখি—

> “... পরেশচন্দ্রের সঙ্কট তদপেক্ষাও বিষম হইয়া দাঁড়াইল। বিবাহের রাত্রিতে গ্রামের বাল্যবন্ধুগণ প্রীতি-উপহারের ছলে তো কত ব্যঙ্গ কৌতুক করিলই;-- অতঃপর যখন সে কর্মস্থলে শহরে গিয়া হাজির হইল, তখনই চারিদিগ হইতে দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কোন সুদূর জঙ্গল হইতে অদ্ভূত জন্তু ধৃত হইয়া আসিলে তাহাকে দেখিবার জন্য যেমনলোক চিড়িয়াখানার দিকে ছুটিয়া যায়; সেই অদ্ভুত জন্তুটা লইয়া নানা ক্রীড়াকৌতুক, ঠাট্টা তামাসা করিয়া থাকে, পরেশের ও সেই অবস্থাহইল। সুপরিচিত বন্ধুগণ ও যে তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল;” - (তদেব পৃঃ ১৩০)

বরাক উপত্যকার সমাজে আধুনিক জীবনবোধের ছোঁয়া লেগেছে। নতুন জীবনবোধে উদ্দীপিত হতে শুরু করেছে সমাজ, বিংশ শতাব্দীর একেবারে সূচনালগ্নে। ‘নারীশক্তি’ বা ‘অশ্রুমালিনী’ উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের সমাজ বাস্তবতা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। সমীহ জাগায়।

শেষকথা: ‘শেষ হয়ে হইল না শেষ’ তবু আপাত সমাপ্তি বিন্দুতে আমাদের পৌঁছাতেই হয়। ‘নারীশক্তি’ বা ‘অশ্রুমালিনী’ উপন্যাসের আলোচনার শেষে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি এ উপন্যাস যথার্থ অর্থে বরাক উপত্যকার প্রথম সামাজিক উপন্যাস প্রথম উপন্যাস হলেও সময়ের চেয়ে বহু এগিয়ে গেছে ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর কল্পনা বিশ্ব। যথার্থ অর্থে আধুনিকতার নান্দনিক ছোঁয়া লেগেছে এই উপন্যাসে।

উল্লেখপঞ্জী :

১। ‘নারীশক্তি’ বা ‘অশ্রুমালিনী’- শ্রী সুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী, বি এ, সম্পাঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য, মহাজাতি প্রকাশন, কলকাতা,৭০০৭৩, ১ম সংস্করণ।
২। ‘বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা’ - রমা পুরকায়স্থ, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-০৯, ১ম সংস্করণ ২০০৫
৩। ‘বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা’- সত্যন্দ্রনাথ রায়, দে’জ পাবলিশিং, কল-৭৩, জানুয়ারী, ২০০০
৪। ‘মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে’-(বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দেজ পাবলিশিং, কল-৭৩, জানুয়ারী-২০০২
৫। ‘কালের প্রতিমা’ (বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বৎসর ১৯২৩-১৯৯৭)- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দেজ পাবলিশিং, কল-৭৩, জানুয়ারী-১৯৯৯
৬। ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’- সুকুমার সেন, পৃঃ ২০৭।
৭। ‘বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস’, ড. বিজিৎ কুমার দত্ত, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৪০২, পৃঃ ২০৯।